"কেডলী সুপ।"

"কেডলী ? কদলীকে কেডলী করেছেন নাকি ?"

"আরে না, না, খেয়েই দেখুন না। গোয়ানিজ প্রিপারেশন—"

দেশী ও বিলাতী

তখন হাসপাতালে চাকরি করি।

মফঃস্বলের একটি কলে বাহিরে গিয়াছি। স্থানটি পল্লীগ্রাম, শহর হইতে বেশ কিছু দূরে। পাঁচ ক্রোশ পথ গো-শকটের সাহায্যে অতিক্রম করিয়া গিয়া দেখি রোগটি অতিশয় সাঙ্ঘাতিক।

একটি শিশুর ডিপথিরিয়া হইয়াছে। শ্বাসনালিটি অবরুদ্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খুবই কষ্ট হইতেছে। শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার করিয়া শ্বাস কষ্টটা লাঘব করিলাম বটে, কিন্তু ডিপথিরিয়ার ইনজেকশন না দিলে যে ছেলেটির জীবন সংশয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

পল্লীগ্রামে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটক্সিন পাওয়া গেল না। আমাদের হাসপাতালের ভাণ্ডার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। শহরের দোকানগুলিতে খুঁজিয়াও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে হইল।

প্রথমে একটি বিখ্যাত দেশী দোকানেই করিলাম। লিখিলাম, "একটি মুমূর্ষু রোগীর জন্য ঔষধটি অবিলম্বে প্রয়োজন। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র পাঠাইয়া দিবেন।" তাহার পর কি মনে করিয়া একটি বিলাতী দোকানেও করিলাম। মনে হইল কি জানি এক স্থানে যদি টেলিগ্রামের গোলমাল হইয়া যায়। যদি দুই স্থান হইতেই ঔষধ আসে ক্ষতি নাই। যাহা বাঁচিবে আমি হাসপাতালেই কিনিয়া লইব।

…পরদিন পোস্টাফিসে লোক বসাইয়া রাখা হইল। পার্শেলটি আসিবামাত্র ছাড়াইয়া আনিবে, অযথা দেরী যেন না হয়।…

সমস্ত দিন পরে লোকটি আমার বাসায় আসিয়া খবর দিল যে একটিও পার্শেল আসে নাই।

বড়ই হতাশ হইলাম। মুমূর্ষু শিশুটির জন্য দুঃখও হইতে লাগিল। আহা, ঔষধটা ঠিক সময়ে পড়িলে ছেলেটা বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত।

অদৃষ্ট এবং ভগবানের ইচ্ছার দোহাই পাড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাহাই করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলাম।

হাসপাতালে আসিয়া দেখি একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

"আপনিই কি ডাক্তার মুখার্জি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"এই চিঠি আর এই ওষুধ নিন।"

দেখিলাম লোকটি সেই বিলাতী দোকান হইতে আসিয়াছে।

দোকানের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন :

"প্রিয় ডাক্তার মুখার্জি,

আপনার টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন ডাকে পাঠাইবার সময় ছিল না। আপনি জানাইয়াছিলেন রোগীটি মুমূর্ষু তাই লোক মারফৎ ঔষধটি পাঠাইতেছি। আশা করি ঔষধটি ঠিক মতো আপনি পাইবেন। ঔষধের বিলও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনার রোগী যদি অবস্থাপন্ন লোক হন, তাহা হইলে আমাদের কর্মচারীর যাতায়াতের ভাড়াটাও দিয়ে দিবেন। ইতি…"

তাহার পর দিনও দেশী দোকান হইতে ঔষধ আসিল না।

তাহার পর দিনও না।

সাতদিন পরে তাঁহাদের একটি পত্র পাইলাম।

তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"প্রিয় মহাশয়,

আজকাল নিম্নলিখিত হারে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটক্সিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত হারে আপনি ঔষধ লইবেন কি না জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি…"

ইঁহাদের আর পত্র লেখার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার রোগীটি ভাল হইয়া গিয়াছিল।

সত্য

সত্য কথাটা ভুলে যাই আমরা বারবার। গল্পটা শুনুন তবে। সেদিন স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। একে জংশন স্টেশন, তার উপর তিন চারখানা ট্রেন লেট। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারি, পেশোয়ারি, ফিরিঙ্গি সবরকম লোক কিলবিল করছে। ওয়েটিং রুমে স্থান নেই। প্ল্যাটফর্মের উপর উপচে পড়েছে যাত্রীর ভীড়। শিশুর চীৎকার, ফেরিওয়ালার চীৎকার, এনজিনের শব্দ, কুলিদের কলহ মিলে একটা হট্টগোল চলেছে। আমি সুটকেসটি হাতে করে একধারে দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। মনে ইচ্ছে ইংরেজরা চলে গিয়ে কি দুর্গতিই হয়েছে আমাদের। ইংরেজদের আমলে দেশ-সুদ্ধ চোর যেন মুখোস পরে ছিল। তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোস খসে পড়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে সকলের। চাষী, মজুর, চাকুরে, ব্যবসাদার সবাই যেন পাল্লা দিয়ে জোচ্চুরি করছে। নেতারা পর্যন্ত ন্যাতা হয়ে গেল। আমার চিন্তাটা অবশ্য ঠিক যে একরঙা ছিল তা নয়। আমি এর অপর দিকটাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে অন্যান্য দেশের অবস্থা কি আমাদের চেয়ে ভাল ছিল ? সাধারণ লোকে কি আমাদের চেয়ে সুখে থাকত ? ফরাসী বিদ্রোহের ঠিক পরের অবস্থা তো সাংঘাতিক হয়েছিল। বলশেভিকরা যখন রাজ্য অধিকার করল তখন সাধারণ লোকেদের অবস্থা যা হয়েছিল তা—সহসা আমার চিন্তায় সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রং লাগল এক পোঁচ। জেনানা ওয়েটিং রুমে আমার স্ত্রীকে ঢুকিয়ে দিয়েছি, যা ভীড়, বেচারি বসতে পেয়েছে কিনা কে জানে। খোকাটাকে কোলে করে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কোলে করেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যা দামাল দুরন্ত… আমার এ চিন্তাকেও ছিন্নভিন্ন করে পরমুহূর্তে